যুগান্তর

তারিখ ... 18 AUG 2015 ...
পৃষ্ঠা ... ২ ... কলাম ... ২ ...

বিপর্যস্ত প্রাথমিক শিক্ষা

২৫ হাজার প্রধান শিক্ষকসহ ৫৫ হাজার পদ খালি

নতুন কারিকুলামের শিক্ষক নির্দেশিকা দেয়া হয়নি

মুসতাক আহমদ

ফরিদপুরের চর শালেপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মোট ছাত্রছাত্রী ৪২৮ জন। কিন্তু এ স্কুলে শিক্ষক আছেন মাত্র একজন। তার নাম রিজা সরকার। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'স্কুলের আমিই প্রধান শিক্ষক, আমিই সহকারী শিক্ষক। পাহারাদারও আমি। সবটা সম্ভব আমি একাই সবকিছু সামলে চলছি।' রিজা আরও জানান, বিদ্যালয়ের পাঁচটি শ্রেণীতে পর্যায়ক্রমে তিনি একাই পাঠদান করছেন। একার পক্ষে সব শিশুকে সামাল দেয়া সম্ভব নয়। এক ক্লাসে ঢুকলে অপর ক্লাসের শিক্ষার্থীদের প্রতি আর নজর দেয়া যায় না। আর এ কারণে তিনি যখন একটি ক্লাসে ঢোকেন, ওই ফাঁকে শিশুরা দুষ্টুমি করেই সময় কাটায়।

কিশোরগঞ্জের করিমগঞ্জ উপজেলার হাওর অধ্যুষিত সুতারপাড়া ইউনিয়নের 'চং নোয়াগাঁও সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়' প্রমত্তা ধনু নদীর তীরে অবস্থিত। ২০১২ সালের জুনে ভাঙনের তাণ্ডবে নদীগর্ভে বিলীন হয়ে যায় বিদ্যালয়টি। পশ্চাৎপদ এই জনপদে শিক্ষার আলো ছড়ানোর একমাত্র প্রতিষ্ঠান এটি। এলাকার শিশুদের লেখাপড়ার কথা বিবেচনা করে ভাঙনের পর গত ৩ বছর ধরে বিদ্যালয়ের কার্যক্রম চালানো হচ্ছে স্থানীয় রাঙামাটি খাল পানি ব্যবস্থাপনা সমবায় সমিতি ভবনে। সেখানে মেঝেতে উপুড় হয়ে বসেই এ বিদ্যালয়ের বিপর্যস্ত : পৃষ্ঠা ১৫ : কলাম ১

● প্রাথমিক শিক্ষা নিয়ে বিশেষ আয়োজন প্রতিবেদন পৃষ্ঠা ১৩

বিপর্যস্ত : প্রাথমিক শিক্ষা

(১ম পৃষ্ঠার পর)

ছেলেমেয়েরা লেখাপড়া করছে। এ বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মো. রফিকুল ইসলাম জানান, ভবন, চেয়ার, টেবিল, বেঞ্চ এমনকি নলকূপ ও ল্যাট্রিন কিছুই নেই। এমন পরিস্থিতিতে প্রাকৃতিক ডাকে সাড়া দিতে শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের স্কুলের পাশের বিভিন্ন বাড়িতে যেতে হয়। যুগান্তরের অনুসন্ধানে জানা গেছে, দেশের অধিকাংশ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের চিত্র উল্লিখিত দুটি স্কুলের মতোই। প্রাথমিকে সমস্যা শুধু শিক্ষক সংকট, অবকাঠামো সমস্যা, টয়লেট আর বিশুদ্ধ খাবার পানির মধ্যেই সীমাবদ্ধ নয়, রয়েছে অসংখ্য সমস্যা। বিদ্যালয়গুলোতে নিয়মিত পাঠদান হয় না। এসব মনিটরিংয়ের জন্য মাঠপর্যায়ের প্রশাসন আছে। কিন্তু তারা ঠিকমতো দায়িত্ব পালন করেন না। কোথাও শিক্ষার্থীদের ওপর চাপিয়ে দেয়া হয়েছে বইয়ের বোঝা। অধিকাংশ বিদ্যালয়ে নির্ধারিত বইয়ের বাইরে অতিরিক্ত বই পড়তে বাধ্য করা হচ্ছে। সরকার প্রায় ৯৭ ভাগ শিক্ষার্থীকে বিদ্যালয়ে ভর্তির কৃতিত্বের কথা বলছে। কিন্তু এসব শিক্ষার্থীর সবাইকে বিদ্যালয়ে ধরে রাখা যাচ্ছে না। যে কারণে ঝরে পড়ার হার এখনও উদ্বেগজনক। সারা দেশে যে সংখ্যক শিক্ষক আছেন, তাদের অনেকের দক্ষতা কাঙ্ক্ষিত পর্যায়ে নেই। দেশে সরকারি বিদ্যালয়ের পাশাপাশি ব্যাঙের ছাতার মতো হাজার হাজার কিন্ডারগার্টেন স্কুল গড়ে উঠেছে। এসব স্কুলের ওপর সরকারি নিয়ন্ত্রণ ও তদারকি নেই বললেই চলে। স্কুলগুলোতে কী পড়ায় তা জানেন না সরকারের সংশ্লিষ্টরা। মূলত শিক্ষার্থীদের ঘাড়ে বইয়ের বোঝা চাপিয়ে দেয়ার পেছনে মূল দায়ী এসব মানহীন ও বাণিজ্যিক মানসিকতায় গড়ে ওঠা কিন্ডারগার্টেন স্কুলগুলো। এ ধরনের স্কুলের বেশির ভাগ শিক্ষকের মান সরকারি স্কুলের শিক্ষকের চেয়েও নিম্ন। কোনো রকমে এসএসসি পাস করা বেশির ভাগ শিক্ষক দিয়ে চলছে বেশির ভাগ কিন্ডারগার্টেন স্কুল। নামমাত্র বেতন দেয়া হয় এসব শিক্ষককে। তাদের আয়ের প্রধান উৎস শিক্ষার্থীদের প্রাইভেট পড়ানোর অর্থ। অর্ধশিক্ষিত এসব শিক্ষকের অনেকেই কারিকুলাম আর পাঠ্যবই বোঝেন না। ফলে পাঠ্যবই যতই উন্নত হোক না কেন, বাস্তবে তা শিক্ষার মানের ওপর কোনো প্রভাব ফেলছে না। বরং শিক্ষার মান সেই আগের মতোই পিছিয়ে আছে। যার প্রমাণ মেলে সরকারি-বেসরকারি এবং আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সংস্থার সমীক্ষায়। বাংলা, ইংরেজি এবং গণিতের মতো বিষয়েও শিক্ষার্থীরা ভালো শিখছে না বলে এসব সমীক্ষায় উঠে এসেছে। শিক্ষার এমন বিপর্যস্ত পরিস্থিতির মধ্যেই অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত প্রাথমিক স্তর উন্নীত করার প্রক্রিয়া চলছে। ইতিমধ্যে প্রায় ৫শ' বিদ্যালয়ে অষ্টম শ্রেণী পর্যন্ত পাঠদান চালু করা হয়েছে। বিভিন্ন স্থানে শিক্ষা উপকরণ ক্রয়ে সরকারের সংশ্লিষ্টদের বিরুদ্ধে দুর্নীতির অভিযোগ যেন স্থায়ী সংস্কৃতিতে পরিণত হয়েছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভবন ও জমিজমা অপদখলও এ খাতের আরেক সমস্যা। এছাড়া নানা কাজে শিক্ষকদের ঘাটে ঘাটে অপমান ও হয়রানির অভিযোগও বিস্তর। বিশেষ করে মাঠপর্যায়ের শিক্ষা অফিসে টাকা ছাড়া শিক্ষকদের বিভিন্ন সেবা না পাওয়ার অভিযোগ সীমাহীন। প্রাথমিক শিক্ষার বিভিন্ন সমস্যা, সংকট ও সম্ভাবনা নিয়ে বিগত দু'মাসের বেশি সময় ধরে যুগান্তর সারা দেশে অনুসন্ধান কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। যুগান্তরের মাঠপর্যায়ের প্রতিনিধিরা সরেজমিন বিভিন্ন বিদ্যালয়ে গিয়ে খোঁজখবর নিয়েছেন। প্রাথমিকের বিভিন্ন সমস্যার বিষয়ে গত জুনে সরাসরি আলোচনা করা হয় প্রাথমিক শিক্ষা অধিদফতরের (ডিপিই) মহাপরিচালক মো. আলমগীরের সঙ্গে। তিনি যুগান্তরকে বলেন, 'প্রাথমিক শিক্ষায় বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভাবনা আছে। সবকিছু নিয়ে আমরা এগিয়ে যাচ্ছি।' তিনি বলেন, 'একসঙ্গে আমি সবকিছু নিয়ে বলতে পারব না। সব তথ্য আমার কাছে থাকে না। তবে এতটুকু বলতে পারি, বিগত সাড়ে ৬ বছরে আমাদের অর্জন অনেক। ড্রপআউট কমেছে। শিক্ষার্থী ভর্তি বেড়েছে। শিক্ষক সংকট আগের মতো নেই। এখন আগের চেয়ে যোগ্যতর শিক্ষক নিয়োগ পাচ্ছেন। প্রধান শিক্ষক নিয়োগ দীর্ঘদিন দিতে পারছি না। এটা শিক্ষকদেরই মামলার কারণে দীর্ঘদিন বন্ধ আছে। অবশ্য এই সমস্যা দূর করার উদ্যোগ নেয়া হয়েছে। এর বাইরে শিশুদের স্কুলে আনতে প্রাক-প্রাথমিক স্তর চালু করা হয়েছে। তাতে শিক্ষকও নিয়োগ দেয়া হচ্ছে। সব মিলিয়ে প্রাথমিক শিক্ষার ব্যাপক উন্নয়ন হয়েছে। এই ধারা অব্যাহত রাখার কাজ চলছে।' তিনি জানান, 'মাঝে মধ্যে কোনো শিক্ষক বা শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে দু-চারটি অভিযোগ আমাদের কাছে আসে। এ অবস্থায় তদন্ত করে ব্যবস্থা নেয়া হয়। কেউই প্রশ্রয় পান না। সর্বশেষ সমাপনী পরীক্ষার খাতা দেখা নিয়ে অভিযোগের পরিপ্রেক্ষিতে কয়েকজন শিক্ষক ও শিক্ষা কর্মকর্তার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া হয়েছে।'

তবে প্রাথমিক শিক্ষার প্রধান ব্যবস্থাপক যা-ই বলুন না কেন, বাস্তবে এই শিক্ষার করুণ চিত্র বেরিয়ে এসেছে অনুসন্ধানে। বিভিন্ন সমস্যার মধ্যে শিক্ষক সংকট, অবকাঠামোগত সমস্যা আর পড়ালেখা পরিবেশ প্রধান সমস্যা হিসেবে চিহ্নিত হয়েছে। ২০১৩ সালের ৮ জানুয়ারি পর্যন্ত দেশে সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা ছিল প্রায় ৩৭ হাজার। ওই বছর ৯ জানুয়ারি প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা আরও ২৬ হাজার বিদ্যালয় জাতীয়করণের ঘোষণা দেন। সবমিলিয়ে বর্তমানে সরকারি বিদ্যালয়ের সংখ্যা ৬৩ হাজারের বেশি। এই প্রত্যেকটি স্কুলে একজন করে প্রধান শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু পুরনো সরকারি বিদ্যালয়গুলোতে প্রায় ১০ হাজার প্রধান শিক্ষকের পদ খালি আছে। এগুলোর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে নতুন জাতীয়করণ হওয়া বিদ্যালয়। এ ধরনের ১৫ হাজার বিদ্যালয়েও প্রধান শিক্ষক নেই। সবমিলিয়ে কেবল ২৫ হাজার প্রধান শিক্ষকের সংকট রয়েছে দেশে। এর বাইরে আরও অন্তত ৩০ হাজার সহকারী শিক্ষকের পদ খালি রয়েছে।

যুগান্তরের বিভিন্ন ব্যুরো অফিস থেকে পাঠানো সরেজমিন প্রতিবেদনেও শিক্ষক সংকটের চিত্র পাওয়া গেছে। চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, চট্টগ্রাম জেলায় মোট বিদ্যালয় আছে ২১৭৯টি। এসব বিদ্যালয়ে ১ জন করে প্রধান শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু ৫৫৪টিতে কোনো প্রধান শিক্ষক নেই। অন্যদিকে এসব বিদ্যালয়ে ৯৮৯১ জন সহকারী শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু ৬৮৩টি পদে কোনো শিক্ষক নেই। ময়মনসিংহ জেলায় প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের ১ হাজার ২৯৯টি পদ খালি আছে। সিলেট জেলা ও সিটি কর্পোরেশন এলাকায় ১৩০১টি বিদ্যালয়ে ১১৭১টি পদ শূন্য আছে। যশোরের ৩০৫ জন প্রধান এবং ৬৩৫ জন সহকারী শিক্ষকের পদ খালি আছে। রংপুরে ১৪৫টি প্রধান ও ২ শতাধিক সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে। বগুড়ায় ১৫৬৮টি বিদ্যালয়ের মধ্যে ২১৭টি পদে প্রধান শিক্ষক নেই। আর সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য আছে প্রায় ৭ হাজার। দেশের বিভিন্ন স্থানে খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, এভাবে শিক্ষক সংকটের কারণে পাঠদান কার্যক্রম দারুণভাবে ব্যাহত হচ্ছে। বগুড়া জেলা প্রাথমিক শিক্ষক সমিতির সভাপতি জুলফিকার আলী ও সাধারণ সম্পাদক ফজলুল করিম জানান, প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ শূন্য থাকায় শিক্ষা ব্যবস্থাপনাসহ পাঠদান দারুণভাবে বিঘ্নিত হচ্ছে। তারা বলেন, যেখানে প্রধান শিক্ষক নেই, সেখানে সহকারী শিক্ষকরা ওই দায়িত্বে আছেন। কিন্তু সহকর্মীকে এ ধরনের দায়িত্বপ্রাপ্তদের মানেন না, সম্মান করেন না। বিধান অনুযায়ী, সরকারি প্রতিটি স্কুলে কমপক্ষে চারজন করে শিক্ষক থাকার কথা। কিন্তু দেশের অধিকাংশ স্কুলেই এটি অনুপস্থিত। তবে যেগুলোতে চারজন রয়েছে, সেসব স্কুলের শিক্ষকরা জানিয়েছেন, বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষক না থাকলে বাকি তিনজনের মধ্য থেকে একজনকে ভারপ্রাপ্ত প্রধান শিক্ষকের দায়িত্ব পালন করতে হয়। তাকে প্রশাসনিক কাজ এবং সরকারি ও স্থানীয় নানা কর্মসূচি নিয়ে ব্যস্ত থাকতে হয়। ওই অবস্থায় বাকি দু'জনকেই মূলত চালাতে হয় ক্লাস কার্যক্রম। একটি স্কুলে প্রাক-প্রাথমিকের ক্লাসের সময় আড়াই ঘণ্টা। আর প্রথম ও দ্বিতীয় শ্রেণীতে চারটি ক্লাস এবং তৃতীয় থেকে পঞ্চম শ্রেণী পর্যন্ত ৪৫ মিনিটের ছয়টি ক্লাস হওয়ার কথা। শিক্ষক নেতারা জানিয়েছেন, এ অবস্থায় যেই স্কুলে প্রধান শিক্ষক আছেন, সেখানেও তিনজন সহকারী শিক্ষকের পক্ষেও স্কুল চালানো কঠিন হয়ে পড়ে। আর যেখানে শিক্ষক সংকট রয়েছে, সেখানকার পরিস্থিতি ভয়াবহ। ওইসব স্কুলে কোনোরকমে সিলেবাস শেষ করানো হয়। কিন্তু শিশুরা বাস্তবে কতটুকু শিখছে তা বলাই বাহুল্য। অথচ আশ্চর্যজনকভাবে প্রতিবছর প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী পরীক্ষায় (পিইসি) গড়ে সব বিদ্যালয়ই ভালো(!) করছে। বিগত ৫ বছরে পিইসিতে পাসের হার ৯০ শতাংশের নিচে নামেনি।

শিক্ষক সংকটের দিক থেকে সরকারি বিদ্যালয়ের চেয়ে বেশি বিপাকে আছে নতুন সরকারি বিদ্যালয়গুলো। সিলেটের জৈন্তাপুর উপজেলার ৩ বছর আগে তিনটি গ্রামে সরকার তিনটি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করে। আসামপাড়া আদর্শগ্রাম সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, খারুবিল সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় ও বিছনাটেক সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় নামের এ তিনটি বিদ্যালয়ে এ পর্যন্ত একজন শিক্ষকও নিয়োগ দেয়নি। ফলে ডেপুটেশনে আনা শিক্ষক দিয়েই চলছে এগুলোর শিক্ষা কার্যক্রম।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের অতিরিক্ত সচিব সন্তোষ কুমার অধিকারী প্রধান শিক্ষক ও সহকারী শিক্ষকের পদ খালি থাকার বিষয়টি নিশ্চিত করে বলেন, প্রধান শিক্ষক পদে ৬৫ ভাগ পদোন্নতি আর ৩৫ ভাগ সরাসরি নিয়োগ করা হয়। মামলার কারণে আমরা এতদিন প্রধান শিক্ষক পদে নিয়োগ করতে পারিনি। সম্প্রতি এ পদ দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত করা হয়। আইন অনুযায়ী এ ধরনের পদে নিয়োগ দেয় সরকারি কর্মকমিশন (পিএসসি)। তিনি বলেন, এরপরও আমরা ওই পদে নিয়োগ দিতে প্রধানমন্ত্রীর নির্দেশনা চেয়ে সার-সংক্ষেপ পাঠিয়েছি। প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয় জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত নিয়ে কাজ করার পরামর্শ দিয়েছে। আমরা এখন জনপ্রশাসন মন্ত্রণালয়ের মতামত নেব।

এদিকে শিক্ষক সংকটের সঙ্গে বিদ্যমান শিক্ষকের মানের সমস্যাও কম নয় বলে জানিয়েছেন সংশ্লিষ্টরা। সম্প্রতি শিক্ষক নিয়োগে শিক্ষাগত যোগ্যতার শর্তে পরিবর্তন এসেছে। এখন এইচএসসি পাস নারী এবং স্নাতক ডিগ্রিধারী পুরুষরা শিক্ষক হতে পারছেন। কিন্তু দীর্ঘদিন এসএসসি পাস নারী শিক্ষক হয়েছেন। খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় শিক্ষক নিয়োগ হওয়ায় সরকারি বিদ্যালয়ে এসএসসি পাস শিক্ষক সংখ্যা তুলনামূলক কম। কিন্তু ২০১৩ সালে জাতীয়করণ হওয়া স্কুলগুলোর শিক্ষকদের বেশিরভাগই এসএসসি পাস। এসব বিদ্যালয়ে যেসব পুরুষ শিক্ষক আছেন, তাদের বেশিরভাগের মান নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন খোদ অন্য শিক্ষকরাই। সরকারি স্কুলের শিক্ষকরা একবার প্রশিক্ষণ পেলেও তাদের অনেকেরই তা নেই। অথচ সব স্কুলই এখন একই কাতারে এসেছে। বিভিন্ন জেলা শিক্ষা অফিস সূত্রে জানা গেছে, নতুন জাতীয়করণ হওয়া এসব শিক্ষকের মান এতটাই নিম্ন যে, অনেকে প্রশিক্ষণ নেয়ার সক্ষমতাও রাখেন না। এ অবস্থায় শিক্ষাবিদ বলছেন, যেহেতু এসব শিক্ষককে ছাঁটাই করা যাবে না, তাই শিক্ষার মান বাড়াতে হলে এসব স্কুলের শিক্ষকদের জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা প্রয়োজন।

এদিকে শিক্ষকদের মান এবং তাদের পাঠদান নিয়ে নানা অভিযোগ থাকলেও প্রাপ্তি-অপ্রাপ্তি নিয়ে (শিক্ষকদের) হতাশাও কম নেই। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে অন্যতম সেরা পেশা শিক্ষকতা। বেতন ও সামাজিক মর্যাদা দুটোর কারণেই ওইসব দেশে এ অবস্থা তৈরি হয়েছে। যে কারণে সেসব দেশে উচ্চশিক্ষিতদের বেশিরভাগ শিক্ষকতা পেশা হিসেবে নিচ্ছেন। অথচ বাংলাদেশে সরকারি প্রাথমিকের শিক্ষকরা চাকরি শুরু করেন মাত্র আট হাজার টাকা বেতনে। আর কিন্ডারগার্টেনগুলোর শিক্ষকদের বেতন দুই-তিন হাজার টাকার বেশি নয়। স্বাভাবিকভাবেই শিক্ষকতা পেশায় উচ্চশিক্ষিত ও মেধাবীরা আসছেন না। জানা গেছে, সরকারি প্রাথমিকের প্রধান শিক্ষকরা এতদিন ছিলেন তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী। সম্প্রতি তারা দ্বিতীয় শ্রেণীতে উন্নীত হয়েছেন। তাও দ্বিতীয় শ্রেণীর সব সুবিধা তাদের দেয়া হয়নি। আবার এ ক্ষেত্রে সহকারী শিক্ষকরা ঠিকই রয়ে গেছেন তৃতীয় শ্রেণীতেই।

শিক্ষক নেতারা বলছেন, সরকারি সমীক্ষায়ই আছে ৩০ ভাগের বেশি শিক্ষক বর্তমানে উচ্চশিক্ষিত। প্রধান শিক্ষকের বাইরে সহকারী শিক্ষকও আছেন এদের মধ্যে। অথচ এসব শিক্ষককে তৃতীয় শ্রেণীর কর্মচারী হিসেবে রাখা হয়েছে। এ নিয়ে হাজার হাজার শিক্ষকের অভিযোগ আর হতাশার শেষ নেই। এ অবস্থায় শিক্ষকদের প্রায়ই ক্লাসরুম ছেড়ে আন্দোলনে রাজপথে বের হতে দেখা যায়।

এ বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজির অধ্যাপক ড. সৈয়দ মনজুরুল ইসলাম বলেন, আমাদের পার্শ্ববর্তী দেশ ভারতে প্রাথমিকের শিক্ষকদের বেতন ৩০ হাজার টাকার উপরে। ভারতের পশ্চিমবঙ্গে শিক্ষকদের জন্য আলাদা বেতন কমিশন আছে। শ্রীলংকায় প্রাথমিক শিক্ষকদের চাকরি প্রথম শ্রেণী করা হয়েছে। মালয়েশিয়ায় শিক্ষকদের অন্যতম মর্যাদায় বসানো হয়েছে। অথচ আমাদের দেশে শিক্ষকরা এখনও অবহেলিত। তিনি বলেন, শিক্ষার ভিত্তি প্রাথমিক। সরকারকে এই বিষয়টি চিন্তা করে চাকরিকে আকর্ষণীয় করতে হবে। পাশাপাশি মেধাবীদের এ ক্ষেত্রে নিয়োগ করতে হবে। তিনি সার্বিকভাবে শিক্ষায় বিনিয়োগ বাড়ানোর পরামর্শ দেন।

শিক্ষকের পর বড় সমস্যা অবকাঠামো ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা নিয়ে। ফরিদপুর ব্যুরো জানিয়েছে, পদ্মার চরে অবস্থিত একটি স্কুলের নাম 'বিএম ডাঙ্গী সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়'। ১৯৯৯ সালে নদীতে এ স্কুলের ভিটে বিলীন হয়ে যায়। এরপর চরহরিরামপুর ইউনিয়নের ইস্তাজ মোল্যার ডাঙ্গী গ্রামের চাঁনমিয়া মেম্বার বাড়ির উঠোনে একটি কাঁচা টিনের ঘর তুলে চালানো হচ্ছে এ স্কুলের শিক্ষা কার্যক্রম। স্কুলে ১৮০ জন শিক্ষার্থীর জন্য বসার বেঞ্চ রয়েছে মাত্র ৬ জোড়া। তিনজন শিক্ষক আছেন। তাদের বসার কোনো অফিস কক্ষ নেই। পাঠদান শেষ করে মেম্বার বাড়ির বাংলো ঘরে বসে বিশ্রাম নেন শিক্ষকরা। টয়লেট আর বিশুদ্ধ খাবার পানির কোনো ব্যবস্থা নেই। বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা আসমা খানম জানান, গত ১৬ বছরে অত্র বিদ্যালয় উন্নয়নের জন্য সরকারি কোনো মঞ্জুরি পায়নি। ৬ আগস্ট যুগান্তরের একজন প্রতিনিধি যশোর সদর উপজেলার পুলেরহাট সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে গিয়েছিলেন। তিনি দেখেন, জরাজীর্ণ একটি ভবনে চলছে শিক্ষার্থীদের দ্বিতীয় সাময়িক পরীক্ষা। টিনের চালে মরিচা পড়ে অসংখ্য ছিদ্রের সৃষ্টি হয়েছে। আর বিদ্যালয়ের দেয়ালের ফাটল রয়েছে অনেক আগে থেকে। যে কোনো মুহূর্তে ভেঙে পড়ার আশংকা রয়েছে। চতুর্থ শ্রেণীর ছাত্রী অলিমা আক্তার তাবাসুম জানায়, বৃষ্টির পানিতে বেঞ্চের ওপর রাখা বই খাতা ভিজে যায়। ক্লাস করতে অনেক কষ্ট হয়। পঞ্চম শ্রেণীর ছাত্র মেহেদী হাসান ও সাগর হোসেন জানায়, আমরা বৃষ্টিতে ভিজি আর গরমে রোদে পুড়ি। আমাদের ক্লাস করতে অনেক কষ্ট। আর প্রধান শিক্ষক আরিফ হাসান জানান, জরাজীর্ণ ভবনের ৬টি কক্ষসহ ১২টি কক্ষে শিক্ষার্থীদের পাঠদান করা হয়। এ বিদ্যালয়ের ৬৫১ জন শিক্ষার্থীর জন্য প্রয়োজনীয় ভবন নেই। জানা গেছে, এই স্কুলের মতো যশোরে ২৪৫টি প্রতিষ্ঠান আছে ঝুঁকিপূর্ণ ভবনে চলছে। চট্টগ্রাম ব্যুরো জানায়, ৫ আগস্ট উজিরপুর সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে সরেজমিন দেখা গেছে, ঝুঁকিপূর্ণ হওয়ায় এ বিদ্যালয়ের পুরনো ভবনটি ভেঙে ফেলা হয়েছে। নতুন ভবনের কাজের আদেশও হয়েছে। কিন্তু ভবনটি নির্মাণের স্থান নির্ধারণ নিয়ে সৃষ্ট জটিলতায় এখনও কাজ শুরু করতে পারেনি ঠিকাদার। অস্থায়ী টিনশেড ঘর নির্মাণ করা হলেও ঝড় বৃষ্টিতে ওই ঘরের চালা উড়ে গেছে। ফলে দীর্ঘদিন ধরে খোলা আকাশের নিচে ক্লাস করছে এ স্কুলের শিক্ষার্থীরা। সাতকানিয়া উপজেলার মধ্যচরতি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের অবস্থা আরও করুণ। খালের পাশ ঘেঁষে অবস্থিত টিনশেডের ভবনটির অবস্থান। খালে জোয়ার আসলে পানি ঢোকে শ্রেণী কক্ষে। আর আকাশে বৃষ্টি নামলে ছুটি ঘোষণা করা হয় স্কুল।

এছাড়া সরেজমিন দেখা গেছে, ময়মনসিংহের গৌরীপুরের কান্দুলিয়া সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে জরাজীর্ণ ভবনে দুর্ঘটনার ভয়ে শিক্ষার্থীদের বের করে মাঠে খোলা আকাশের নিচেই পাঠদান করা হয়। আর সিলেটের গোয়াইনঘাট উপজেলার পাইকরাজ সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়টি এমনই জরাজীর্ণ যে, শ্রেণীকক্ষে কেঁচো, ব্যাঙ, সাপসহ পোকা-মাকড়ে কিলবিল করে প্রায় সর্বদা। এর মধ্যেই ক্লাস করতে হচ্ছে কোমলমতি শিক্ষার্থীদের। এ স্কুলের পাকা ভবন নির্মাণ ও উন্নয়নের জন্য প্রায় প্রতি বছরই বরাদ্দ দেয়া হয়। কিন্তু তা আর বাস্তবায়ন হয় না। গোয়াইনঘাটের ভারপ্রাপ্ত উপজেলা শিক্ষা কর্মকর্তা রফিকুল ইসলাম যুগান্তরকে বলেন, আদালতে মামলা থাকায় উন্নয়ন কাজ ব্যাহত ও শিক্ষার মান ধরে রাখা যাচ্ছে না।

প্রাথমিক ও গণশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপ-প্রধান ড. ইমতিয়াজ মাহমুদ এ বিষয়ে যুগান্তরকে বলেন, প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ব্যবহার অনুপযোগী বা আপনাদের ভাষায় ঝুঁকিপূর্ণ ভবনের তালিকা আমাদের কাছে আছে। এগুলো তালিকাভুক্ত করা আমার দৈনিক কাজেরই অংশ। তিনি বলেন, সারা দেশে নয় হাজার বিদ্যালয়ের ভবন তৈরির জন্য আমরা তালিকা তৈরি করেছি। প্রয়োজনীয় অর্থ বরাদ্দ পেলেই কাজ শুরু হবে। তবে অনেক স্থানে বিগত অর্থবছরে বেশকিছু বিদ্যালয় সংস্কার করা হয়েছে বলে জানান তিনি।

খোঁজ নিয়ে জানা গেছে, ২০১৩ সাল থেকে প্রাথমিকে নতুন কারিকুলামের আলোকে রচিত পাঠ্যবই পড়ানো হচ্ছে। প্রায় আড়াই বছর আগে প্রাথমিকে এ পাঠ্যবই প্রবর্তন করা হলেও শিক্ষকদের এখন পর্যন্ত এ বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া হয়নি। এমনকি শিক্ষকদের জন্য পাঠদান নির্দেশিকাও দেয়া হয়নি। ফলে শিক্ষকরা নতুন বই আর তার কারিকুলামের ব্যাপারে একেবারেই অন্ধকারে রয়েছেন। না বুঝে এবং অনেকটাই হাতুড়ে ডাক্তারের মতো হাতিয়ে পাঠদান করতে হচ্ছে শিক্ষকদের।

বিষয়টি জাতীয় পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের (এনসিটিবি) চেয়ারম্যান অধ্যাপক নারায়ণ চন্দ্র পালও স্বীকার করেছেন। যুগান্তর প্রতিনিধিরা সরেজমিন স্কুল পরিদর্শনকালে অসংখ্য শিক্ষার্থী ও শিক্ষক-অভিভাবক বইয়ের মান নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন।

(এ প্রতিবেদন তৈরিতে সহায়তা করেছেন : যুগান্তরের রংপুর ব্যুরোর মাহবুব রহমান, সিলেট ব্যুরোর রেজওয়ান আহমদ, কিশোরগঞ্জ ব্যুরোর এটিএম নিজাম, বগুড়া ব্যুরোর নাজমুল হুদা নাসিম, ময়মনসিংহ ব্যুরোর আতাউল করিম খোকন, যশোর ব্যুরোর ইন্দ্রজিৎ রায়, ফরিদপুর ব্যুরোর জাহিদ রিপন এবং চট্টগ্রাম ব্যুরোর নাসিরউদ্দিন রকি)